ফজলুল হক বাঙালি মুসলিম পরিচয় নির্মাণের পথপ্রদর্শক : জহর সরকার | RaajKahan (রাজকাহন)

ডেস্ক রিপোর্ট

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পাশাপাশি ‘শের-ই-বাংলা’ এ কে ফজলুল হকই ছিলেন অখণ্ড বাংলার প্রকৃত নেতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তিনি ছিলেন বাঙালির নেতা, কৃষক ও শ্রমিকের নেতা। বাঙালি মুসলিম জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও পথপ্রদর্শক। শুক্রবার কলেজ স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ফজলুল হক: ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন’ শীর্ষক স্মারক বক্তৃতায় ঠিক এ কথাই তুলে ধরে আধুনিক প্রজন্মকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন জহর সরকার। এ ক্ষেত্রে রাজ্যসভার সাংসদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, ‘জন্মের সার্ধশতবর্ষে ফজলুল হককে একজন বাঙালি নেতা হিসেবে তুলে ধরেই তাঁর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।’

প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সভাপতি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক এন জে আফ্রিদি প্রমুখ।

আগামী অক্টোবরে এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালিত হবে। তার দু’মাস আগে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল সুশোভন চন্দ্র সরকার স্মারক বত্তৃ«তার। সেখানেই আলোচনার মূখ্য বিষয় ছিলেন শের-ই-বাংলা। অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনার শিরোনামে এনে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি অনুষ্ঠিত হল তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ফজলুল হকও ছিলেন সেই ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তুখোড় মেধাবী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তেমনটাই ছিলেন তিনি। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার পি সি মহলানবিশ অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে উপস্থিত অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্রছাত্রীদের জানালেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত প্রিয় ও কৃতী ছাত্র ছিলেন এ কে ফজলুল হক। প্রেসিডেন্সি কলেজে হক যখন পড়তে আসলেন তখন তাঁর মেধায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ১৮৯৪ সালে তিনি একই বছরে রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা তিনটি বিষয়ে অনার্সসহ কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষা পাশ করেন, যা ছিল একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ইংরেজি ভাষায় এমএ পড়া শুরু করলেও পরে তিনি ম্যাথমেটিকসে এমএ ডিগ্রি নেন।

এদিনের স্মারক বক্তৃতায় জহর সরকার এ কে ফজলুল হককে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন একজন আপাদমস্তক বাঙালি নেতা হিসেবে। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ওঠে অনেক সময়। এর যুৎসই জবাব দিয়েছেন জহর সরকার। এ প্রসঙ্গে হক সাহেবের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি জানান, “১৯১১ থেকে মুসলিমদের অধিকার আদায় ও দাবিদাওয়ার রাজনীতি নিয়ে সরব হন ফজলুল হক। সেই সময় তাঁকে শুনতে হল ‘আপনি সাম্প্রদায়িক’। ইতিহাসের পাঠক হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক ও ‘সম্প্রদায়ভিত্তিক দাবি’ কিন্তু আলাদা। তখন উচ্চবর্ণের তথাকথিত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির (যারা ছিল আসলে অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ) মানুষ চাকরির ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশের বেশি পদ অধিকার করে রেখেছিল। মুসলমানরা ৫১ শতাংশ হয়েও চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। এ জন্যই তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন মুসলমানদের হয়ে। এ জন্য তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলা যাবে কি?’ উপস্থিত বিদগ্ধজনের সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দেন একসময়ের দুঁদে আমলা জহর সরকার। তাঁর মত, এ কে ফজলুল হক আসলে বাঙালি মুসলমানদের পরিচয় নির্মাণের একজন পথপ্রদর্শক।

মাটির কাছাকাছি থেকে প্রান্তিক মানুষের জন্য রাজনীতি করে গেছেন বরিশালের হক সাহেব। মুসলিম লিগ বা কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন না করে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে তাই তিনি বাজিমাত করতে পেরেছিলেন। তাকে বেশ কয়েকবার নাইটহুড দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ‘আমি চাষার পোলা, নাইটহুড কী করব?’ বলে তিনি তা নেননি। রাজনৈতিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে জহর সরকার বলেন, ‘তাঁর রাজনীতি ছিল আবেগময়। তাঁকে এ পর্যন্ত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। বাঙালি মুসলিমকেই কি আমরা মনেপ্রাণে জায়গা দিয়েছি? সেই মাপের নেতা তো আর উঠে আসেনি। বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ফজলুল হক। গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অন্য মুসলিম নেতারা উর্দুভাষী ছিল। একশ্রেণির ‘আশরফ’রা নিজেদের বাঙালি মুসলিম বলেও পরিচয় দেননি। সেই প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলিম জাতিসত্তার প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন ফজলুল হক। জোর গলায় বাঙালি মুসলমান সত্তাকে তুলে ধরেছেন ফজলুল হক। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ উনার হাতে গড়া। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, ছাত্রাবাস ও স্কুল কলেজ নির্মাণে তিনি সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন। এখান থেকে শুধু মুসলিমরাই শিক্ষিত হয়নি, সব ধর্মের মানুষই সুবিধা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলার নেতা।’ চিত্তরঞ্জন দাশের পরেই তাঁকে বাঙালি নেতা হিসেবে তুলে ধরে তাঁর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে বলে মনে করেন জহর সরকার।

রাজ্যসভার সাংসদ আরও বলেন, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে জিতে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়লেও হিন্দুদের স্থান দিয়েছিলেন ক্যাবিনেটে। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি ‘ঋণ সালিশী বোর্ড’ গঠন করেন, যার ফলে দরিদ্র চাষীরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়। পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও সবাইকে সবরকম পরিস্থিতিতে একসঙ্গে নিয়ে চলার আশ্চর্য কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। তাই তাঁর মন্ত্রিসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা যেমন ঠাঁই পেয়েছেন, তেমনি স্থান হয়েছে নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দেরও। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ফজলুল হকের সরকারের কোনও ক্ষমতা ছিল না। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। তিনি রেশনিং সিস্টেম চালু করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে মন্তব্য করেন জহর সরকার। এমন এক সময়ে হক সাহেবের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করলেন জহর সরকার, যখন সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার রাজনীতিতে আচ্ছন্ন দেশ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইতিহাসের একজন অসাম্প্রদায়িক, জনদরদি নেতার কথা শোনা গেল প্রেসিডেন্সির অলিন্দে। বস্তুনিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পথ দেখালো ইতিহাস সংসদও। (*পুবের কলম* অবলম্বনে)।